

মানবধর্ম : রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ

কৃষ্ণ ধীবর

Link : https://santiniketansahityapath.org.in/wp-content/uploads/2026/01/21_Krishna-Dhibar.pdf

Abstract: The concept of Humanism or Human Religion occupies a central place in modern Indian philosophical thought and it finds profound expression in the works of Rabindranath Tagore and Swami Vivekananda. Though emerging from different spiritual and intellectual backgrounds, both thinkers envisioned a universal humanism that transcends narrow boundaries of caste, creed, nation, and dogmatic religion. This paper explores the idea of Humanism as articulated by Rabindranath Tagore and Swami Vivekananda, highlighting their convergences and divergences.

Rabindranath Tagore's humanism is rooted in harmony, creativity, freedom, and the unity of humanity with nature. He emphasized the spiritual realization of the infinite within the finite human self and advocated a religion of man grounded in love, compassion, and universal fellowship. For Tagore, true religion lies not in ritual or institutional authority but in the moral and aesthetic awakening of the human soul. Swami Vivekananda, on the other hand, interpreted Humanism through the lens of Vedantic philosophy. He emphasized the divinity inherent in every human being and stressed service to humanity as service to God (Shiva Jnane Jiva Seva). His humanism is dynamic and action-oriented, focusing on social upliftment, strength, self-confidence, and the eradication of poverty and ignorance. By examining their philosophical foundations, this study demonstrates how Tagore's spiritual humanism and Vivekananda's practical Vedantic humanism together offer a holistic vision of human dignity, universal brotherhood, and ethical responsibility. Their ideas remain deeply relevant in addressing contemporary global challenges such as intolerance, materialism, and social inequality.

Keywords: Human Religion, Manab Dharma, Rabindranath Tagore, Swami Vivekananda, Indian Humanism, Universal Brotherhood.

“বহুরূপে সন্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর

জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।”

মানুষ সামাজিক জীব, সভ্যতার সেই আদিকাল থেকে অদ্যাবধি সামাজিক বন্ধনের মধ্যেই মানুষের বড়ো হওয়া, ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটানো। শারীরিক গঠন ছাড়া মানুষের ব্যক্তিত্বের প্রায় সবটাই সমাজ থেকে প্রাপ্ত। মানবাকায় বিশিষ্ট হলেও সে মনুষ্য পদবাচ্য হয় না, তার জন্য প্রয়োজন কিছু আস্তর অনুভূতির। সেই আস্তর অনুভূতিলোকে মানুষের আধ্যাত্মিক প্রকাশই হলো ধর্ম। প্রাচীনকাল থেকেই ‘ধর্ম’ শব্দটি ব্যাপক অর্থে প্রচারিত। সংস্কৃত ‘ধৃ’ ধাতুর উত্তর মন্ প্রত্যয়যোগে ‘ধর্ম’ শব্দটি নিষ্পন্ন, যা একাধিক আভিধানিক অর্থে পূর্ণ। যেমন, শুভাদৃষ্ট, পুণ্য, সৎকর্ম, যজ্ঞ, শাস্ত্রাচার, স্বভাব, রীতি ইত্যাদি। ‘ধৃ’ ধাতুর অর্থ ধারণ করা, সমাজের ও ব্যক্তিত্বের রীতি-নীতি আচার-আচরণের ধারকই হলো ধর্ম। অপরপক্ষে ‘বিশেষগুণ’ বোঝাতেও ধর্ম শব্দটি প্রযুক্ত। শাস্ত্রবিহিত আচার-সদাচার ও মানুষের স্বকীয় শুভচিন্তনও ধর্মরূপে বিবেচিত। মনুসংহিতাকারের উপলব্ধিতে তা প্রতিফলিত —

“বিদ্বদ্ভিঃ সেবিতঃ সন্তির্নিত্যমদ্বৈতরাগিভিঃ ।

হৃদয়োনাভ্যনুজ্ঞাতো যো ধর্মস্তন্নিবোধত ।”^২

ধর্মপ্রিয় অশোকের “দেবানাং প্রিয় প্রিয়দর্শী”^৩ অনুশাসন ধর্মের নিষ্ঠারূপের পরিচায়ক। আবার কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গানে দাঁড়িয়ে শ্রীকৃষ্ণের উৎসাহে অর্জুনের “নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লপ্ধা” উপলব্ধি ধর্মের সেই সত্য স্বরূপেরই প্রকাশ। ধর্মের ভাবজগৎ যেমন একজন ছাত্রের অধ্যয়নকে তপস্যায় উন্নীত করে, তেমনি একজন কবি বা দার্শনিকের শ্রেষ্ঠ উপলব্ধিকেও সার্থক করে। সুতরাং ধর্ম হলো ব্যক্তিহৃদয়ের সেই আদর্শ, তার আন্তর্জগতের অনুভূতিকে বহিঃপ্রকৃতির সঙ্গে মিলিয়ে দেয়, যা মানবধর্মরূপে অঙ্কুরিত হয়ে বিশ্বধর্মে উন্নীত হয়।

রবীন্দ্রজীবনের আধ্যাত্মিকতা বা বিবেকানন্দের ধর্মীয় চিন্তাভাবনা যাইহোক না কেন, তাঁদের ভাবনার মূল স্রোত যে সূত্রে মিলিয়ে গেছে তা হলো মানবতাবোধ, যা মানবধর্মের মূল চাবিকাঠি। উভয়ের মানবতাবোধ বা মানবধর্ম কতকগুলি জীবনসূত্রে বাঁধা, সেগুলি হলো, ক) কর্মময় জীবনের আড়ালে মানবধর্ম খ) ঐক্যানুভূতি গ) সংকীর্ণতার উর্ধ্বে মানবধর্ম এবং ঘ) রবীন্দ্র বিবেক ধর্মে মানুষ।

ক) কর্মময় জীবনের আড়ালে মানবধর্মঃ

ব্যবহারিক কর্মজীবনের হাত ধরেই জীবন ছন্দময় ও আনন্দমুখর হয়ে ওঠে। উপনিষদ অনুসারে সৃষ্টি-প্রলয়ের খেলায় ব্রহ্ম সদা লিপ্ত। অদ্বৈতব্রহ্মের দ্বৈতরূপের প্রকাশ আনন্দেই জন্যই — “সত্যের আনন্দরূপ এ ধূলিতে নিয়েছে মুরতি ।”^৪ এই আনন্দের জন্য বিশ্ব সৃষ্টি করে তিনি বিশ্বকৃৎ —

“স বিশ্বকৃৎ স হি সর্বস্য কর্তা

তস্য লোকঃ স উ লোক এব ।”^৫

শ্রষ্টা সৃষ্টি করেই ক্ষান্ত নয়, বিশ্বকর্মারূপে সৃষ্টির মধ্যে সদা জাগ্রত। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের ভাষায় — “এষ দেবো বিশ্বকর্মা মহাত্মা সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ ।”^৬ অর্থাৎ এই নিখিল চরাচরের সৃষ্টিকর্তা মহাত্মা, সর্বশক্তিমান, সর্বব্যাপী, পরমদেব, পরমেশ্বর সর্বদা মানবহৃদয়ে সন্নিবিষ্ট। সুতরাং ঋষির অনুভূতি অনুসারে তাই শ্রষ্টার সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক চিরকালের, শ্রষ্টা কর্মের মধ্যেই সৃষ্টিতে জীবন্ত, তাই সংসারের মধ্যেই তাঁকে পাওয়া যায়, তাই কবির আহ্বান,

“আপনি প্রভু সৃষ্টিবাঁধন প’রে

বাঁধা সবার কাছে।

রাখো রে ধ্যান, থাক্ রে ফুলের ডালি,

ছিঁড়ুক বস্ত্র, লাগুক ধুলাবালি-

কর্মযোগে তাঁর সাথে এক হয়ে

ঘর্ম পড়ুক ঝরে ।”^৭

কবির ভাষায় জীবনদেবতার সঙ্গে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখলেই দুঃখ, আর মিলিয়ে দিলেই মুক্তি, সেই মিলিয়ে দেওয়ার কৌশলটি হলো কর্মযোগ। নিষ্কাম কর্মই হলো মানবধর্মের প্রকৃতসূত্র। কর্ম মানুষকে হাজার বছর বাঁচিয়ে রাখে, উপনিষদঋষির “কুর্বন্নেবেহ কর্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ ।”^৮ এই অনুভূতি বন্ধনের নয়, মুক্তির। বিশ্বসত্তা নিজেই কর্মের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে রেখে প্রমাণ করেছেন বৈরাগ্যময় কর্মের সাধনেই মুক্তি মেলে। বৈরাগ্যময় কর্ম বলতে বোঝায় সেই কর্ম, যে কর্মের ফল আমাদের বেঁধে রাখে না। সাংখ্যে তিন প্রকার বন্ধনের কথা বলা হয়েছে প্রকৃতিক, বৈকৃতিক, এবং দাক্ষিণ্যক।^৯ সুতরাং স্বার্থশূন্য কর্মের ইজিাত মেলে সাংখ্যে। মানবতাবাদী দার্শনিক বিবেকানন্দের ব্যক্তিগত জীবনচরিত ছিল সেই কর্মযজ্ঞে বা মানবকল্যাণে উৎসর্গীকৃত। বেদান্তের অদ্বৈতানুভূতি তাঁকে শিখিয়েছিল জীব ব্রহ্মেরই অংশ, আর ব্রহ্মভিন্ন সবই অনিত্য, তাই

ব্রহ্মস্বরূপ জীবের কল্যাণ তাঁর কাছে শ্রেষ্ঠ বেদান্তিক শিক্ষা। তাই রামকৃষ্ণের বেদান্তচেতনায় প্রভাবিত বিবেকানন্দ পরোপকারের মধ্যেই নিজের মুক্তি খুঁজতেন। তিনি বলতেন —

“পরোপকার করা এক পরম সুযোগ ও সৌভাগ্য। উচ্চ মঞ্চার উপর দাঁড়াইয়া পাঁচটি পয়সা লইয়া বলিও না, “এই যে বেচারী”, বরং তাহার প্রতি কৃতজ্ঞ হও—এই গরীব লোকটি আছে বলিয়া তাহাকে সাহায্য করিয়া তুমি নিজের উপকার করিবে পারিতেছ। যে গ্রহণ করে সে ধন্য হয় না, যে দান করে সেই ধন্য হয়। তুমি যে তোমার দয়া করুণাশক্তি জগতে প্রয়োগ করিয়া নিজেকে পবিত্র ও সিদ্ধ করিতে সমর্থ হইতেছ, এজন্য তুমি কৃতজ্ঞ হও।”^{১০}

সন্ন্যাসীর জীবনদেবতা ঈশ্বর নয় মানুষ, কল্যাণাদি কর্মের মধ্য দিয়ে মানুষরূপী ঈশ্বরের সঙ্গে যোগসূত্র রচিত হয়। কর্মময় জগতের সঙ্গে এক হয়ে মুক্তিলাভের পথকে কবিও স্বাগত জানিয়েছিলেন। তাই কর্মী মানুষের জয়গান শোনা যায় তাঁর বাণীতে। শত শত সাম্রাজ্যের ভগ্নশেষ পরে যারা সমাজের ইমারত তৈরী করে তাদের জন্য কবির উপলব্ধি —

“মন্দির করিয়া তোলে জীবনের মহামন্ত্রধ্বনি
শত শত সাম্রাজ্যের ভগ্নশেষ পরে,
ওরা কাজ করে।”^{১১}

তাই বেদান্তের ব্রহ্ম বা জীবনদেবতার কাছে তাঁর আহ্বান “কর্মক্ষেত্রে করি দাও সক্ষম স্বাধীন।”^{১২} এ শুধু কবির বাণী নয়, হৃদয়ের অন্তঃস্থলের তীব্র উৎসার। যেখানে কর্মযোগের মধ্য দিয়ে মানবধর্মের ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

খ) ঐক্যানুভূতি:

ঋষিসাধনায় মানবধর্মের দ্বিতীয় সুর হলো ঐক্যানুভূতি। উপনিষদ্ কখনো খণ্ডতার কথা বলেনি, বলেছে অখণ্ডতার কথা, বলেছে বিশ্বাসভার কথা, নিত্য তত্ত্বের কথা, যে তত্ত্ব —

“ন জায়তে স্রিয়তে বা বিপশ্চিন্
নায়ং কুতশ্চিন্ন বভূব কশ্চিৎ।
অজো নিত্যঃ শাস্ততোহয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে।”^{১৩}

যে তত্ত্ব মানবানুভূতির অনেক উর্ধ্বে, ঋষিরা হৃদয়বৃত্তি দিয়ে নয়, প্রজ্ঞাবৃত্তি দিয়ে উপনিষদের ধর্মকে গ্রহণ করেছিলেন। ধীশক্তির সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক চিরকালের, “ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ”^{১৪} যেন সেই সম্পর্কের যোগসূত্র রচনা করে। উপনিষদের বিশ্ববোধকে রবীন্দ্রনাথ মানবতাবোধে রূপান্তরিত করলেন তাঁর জীবনসাধনায়, সমগ্র থেকে বিচ্ছিন্ন জীব দুঃখের প্রতিঘাতে জর্জরিত, বিরোধ থেকে নিজেকে বের করে এনে সকলের মধ্যে নিজেকে বিলিয়ে দেওয়ার মধ্যে রয়েছে প্রকৃত মুক্তি। অপরের মধ্যে নিজেকে দেখার যে শিক্ষা উপনিষদ্ ঋষিরা তাঁদের উপলব্ধিতে স্থান দিয়েছিলেন। কবির ভাবনায় তা কানায় কানায় পূর্ণ —

“খণ্ডতার মধ্যে কদর্যতা, সৌন্দর্য একের মধ্যে; খণ্ডতার মধ্যে প্রয়াস, শান্তি একের মধ্যে; খণ্ডতার মধ্যে বিরোধ, মঙ্গল একের মধ্যে; তেমনি খণ্ডতার মধ্যেই মৃত্যু, অমৃত সেই একের মধ্যে।”^{১৫}

এই একের আরাধনাতেই মানবজীবন প্লাবিত, সেই প্লাবনে ঋষির অনুভব আর কবির উপলব্ধি যেন এই সরলরেখায় মিলিয়ে যায় —

“যুক্ত করো হে সবার সঙ্গে,
যুক্ত করো হে বন্ধ,
সঞ্চার করো সকল কর্মে
শান্ত তোমার হৃদ।”^{১৬}

বেদান্তিক বিবেকানন্দও অখণ্ডবোধের দৃষ্টিতেই মানবধর্মকে ব্যাখ্যা করেছেন। উপনিষদ্ বলেন সর্বভূতের মধ্যে

যিনি নিজেকে দেখেন বা নিজের মধ্যে যিনি সর্বভূতকে দেখেন, তিনি কখনো কাহারও হিংসা করেন না —

“যন্তু সর্ব্বাণি ভূতান্যাত্মন্যেবানুপশ্যতি
সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপসতে ।”^{১৭}

এই ঐক্যানুভূতি মানবধর্মের শ্রেষ্ঠ অনুভূতি। বিবেকানন্দ শঙ্করপন্থী দার্শনিক, তাই অদ্বৈতবেদান্তের মায়াবাদকে তিনি সাদরে বরণ করে নিয়েছিলেন, তাই পার্থিব জগতে ব্রহ্মভিন্ন সবকিছুকেই ময়া বলে অস্বীকার করেছেন সন্ন্যাসী। অর্থাৎ তাঁর কাছে ব্রহ্ম ভিন্ন সবই অনিত্য, তাই অনিত্য সুখের পিছনে ছুটে কি লাভ? এই তত্ত্বের আলোয় যদি জীবন আলোকিত হয়, তাহলে জীবের মধ্যে কোনো ভেদবুদ্ধি থাকবে না, ফলে জীবন থেকে হিংসা, মারামারি, কাটাকাটি সরে যাবে, জীবন অপরের হিতসাধনে লিপ্ত হবে, তাই স্বামীজি বললেন —

“কেবল অদ্বৈতবাদের দ্বারাই নীতিতত্ত্বের ব্যাখ্যা হইতে পারে। প্রত্যেক ধর্মই প্রচার করিতেছে যে, সকল নীতিতত্ত্বের সার-অন্যের হিতসাধন। সকল ধর্মই উপদেশ দিতেছে — নিঃস্বার্থ হও ।”^{১৮}

বিচারাত্মক দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, সন্ন্যাসী বা কবি উভয়েই অপূণ্য থেকে পূণ্যে, খণ্ড থেকে অখণ্ডে উত্তরণকে জীবনধর্মের শ্রেষ্ঠ জায়গায় নিয়ে গেছেন। উভয়েই স্বীকার করেছেন, অখণ্ডবোধ মানবাস্তরে জাগ্রত হলে মানুষের অন্তরে যে আদর্শ জাগ্রত হয়, তাই হলো মানবধর্ম। এই অখণ্ডবোধ শুধু নিজেকে পূর্ণ করে না, পূর্ণ করে সমষ্টিকে, ক্ষুদ্র স্বার্থের বেড়াজাল অতিক্রম করে বৃহত্তর স্বার্থে পৌঁছানোর আহ্বান জানায়। এই সূক্ষ্ম চিন্তা মানবকল্যাণের পথকেই প্রশস্ত করে, অদ্বৈতবোধ বা অখণ্ডতায় মূল চাবিকাঠি হলো প্রেম। প্রেমের পথ ধরেই খণ্ড থেকে অখণ্ডে পৌঁছানো সম্ভব। যে পথে মানুষ ঈশ্বরের সম্মান পান। আর সন্ন্যাসী অনুভব করেন —

“জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর ।”^{১৯}

মানবপ্রেমের হাত ধরেই মানবধর্ম অঙ্কুরিত হয় আর প্রেমের আধ্যাত্মিকতায় তা পল্লবিত হয়ে মহীরুহে পরিণত হয়, স্বামীজি মানবপ্রেমের মধ্য দিয়ে পরমানন্দ প্রাপ্তির যে ইঞ্জিত দিয়েছেন, তা ঋষির অনুভূতির সঙ্গে একাকার হয়ে যায়। বিবেকানন্দের ভাষায় —

“মানবপ্রেমের মধ্য দিয়া এই পরমানন্দই তোমাদের নিকট আসে; মানবীয় ভালোবাসা এই আধ্যাত্মিক আনন্দেরই ছায়াপাত্র, কিন্তু মানবীয় আনন্দের সহিত ইহাকে এক করিয়া ফেলিও না। এই একটি বড় রকমের ভুল সর্বদাই হইতেছে। আমরা প্রতিমূহূর্তে আমাদের দৈহিক ভালোবাসা, এই মানবীয় প্রেম, এই তুচ্ছ সসীমের প্রতি আকর্ষণ, সমাজের অন্তর্গত অপরাপর মানুষের প্রতি এই বিদ্যুৎসদৃশ আকর্ষণকে আমরা পরমানন্দ বলিয়া ভুল করিতেছ ।”^{২০}

মানবধর্মকে প্রেমের পথে উত্তীর্ণ করে রবীন্দ্র অনুভূতিও জয়লাভ করেছে। বেদান্তের ব্রহ্ম, আত্মা বা তাঁর সঙ্গে মিলন এ তো তত্ত্বকথা। সেই তত্ত্বকে প্রেমের পথে সাধনায় রূপান্তরিত করেছেন কবি। কখনো বাউলের একতারার মধ্য দিয়ে কখনো বা সংগীতের সুরের মধ্য দিয়ে সেই প্রেম, সাধনায় প্রকাশিত। সেই সাধনায় বেদান্তের ব্রহ্মকেই প্রেমানন্দের মর্যাদা দিয়েছেন কবি। সেই প্রেমানন্দের সঙ্গে মিলনের জন্য মানুষকে প্রেমিক হতে হয়। তাই কবি বললেন —

“এই প্রেমস্বরূপের সঙ্গে আমাদের সম্পূর্ণ যোগ হলেই আমাদের সমুদয় ইচ্ছার পরিপূর্ণ চরিতার্থতা হবে। সম্পূর্ণ যোগ হতে গেলেই যার সঙ্গে যার যোগ হবে তার মতন হতে হবে। প্রেমের সঙ্গে প্রেমের দ্বারাই যোগ হবে।... সুতরাং প্রেমস্বরূপের সঙ্গে মিলতে গেলে আমাদের সম্পূর্ণ স্বাধীন হতে হবে।”^{২১} এইভাবে প্রেমের পথে মানবধর্মকে ব্যাখ্যা করেছেন দার্শনিক কবি রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ।

৩) সংকীর্ণতার উর্ধ্বে মানবতাবাদ:

ঔপনিষদিক ধর্ম কোনো নির্দিষ্ট সীমায় নয়, সেদিনের সমাজে জীবনের গুরুতর সমস্যার সমাধান পেয়েছে মানুষ উপনিষদের নৈতিক আদর্শ থেকে। যে আদর্শ গুরু শিষ্য পরম্পরায় প্রচারিত। সমাবর্তনের সভায় শিষ্যকে উপদেশ

দিতে গিয়ে যখন গুরু বলেন — “দদদ ইতি দাম্যত দত্ত দয়ধ্বমিতি তদেতৎ ত্রয়ং শিক্ষেদ্ দমং দানং দয়ামিতি।”^{২২} তখন নৈতিক ধর্ম সংকীর্ণতার উর্ধ্বে বিচরণ করে। এই নৈতিকতা মানবতাবাদের মূল স্রোত। এই নৈতিকতার অভাবেই সমাজ আজ বেদনার যুগকাণ্ডে বলিপ্রদত্ত। সত্যের অভাবে সভ্যতা আজ বিপর্যয়ের পথে। এই নৈতিক আদর্শ আজ সত্যের হাত ধরে সমাজ এগিয়ে যেতে পারে, যদি মানুষ মিথ্যা অহংকার আর সংকীর্ণতার উর্ধ্বে উঠতে পারে। উপনিষদ্ প্রেমী বিবেকানন্দ কোনো নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের জন্য কোনো উপাসনাবিধির উপর গুরুত্ব আরোপ করেননি। সকল সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদমুখর সন্ন্যাসী বারংবার আত্মপ্রত্যয়ের কথা বলেছেন, ‘অভী’ মন্ত্রের মধ্য দিয়ে। তাঁর মতে মানুষই সভ্যতার প্রকাশক। দেহ-মনের উপাসনায় মানুষ সিংহের ন্যায় গর্জন করে স্বরূপে প্রকটিত হতে পারে। সকল হীনমন্যতাকে মুছে ফেলে মানুষই পারে, জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন নিতে, তাই মানুষের ধর্ম তাঁর কাছে বড়ো ধর্ম। তাই তিনি বললেন —

“সংকীর্ণ ধারণা ত্যাগ কর এবং প্রত্যেকের মধ্যে সেই ঈশ্বরকে দর্শন কর, যিনি সকল হাত দিয়া কার্য করিতেছেন, সকল পা দিয়া চলিতেছেন, সকল মুখ দিয়া খাইতেছেন। প্রত্যেক জীবে তিনি বাস করেন, সকল মন দিয়া তিনি মনন করেন।”^{২৩} তবে সম্প্রদায় ধর্মকে বিশ্বজনীনতার আঙ্গিকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বিবেকানন্দ অনেক সময় রামকৃষ্ণের “যত মত তত পথ” তত্ত্বের অনুসরণ করেছেন। তবে এভাবে ধর্মতত্ত্বকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কিছু বাহ্য আচার অনুষ্ঠান স্থান পেয়েছে তাঁর ব্যাখ্যাত ধর্মে। তবে সাধকের মূল আদর্শ থেকে বিচ্যুত হননি তিনি, বিচিত্রের মধ্যে ঐক্য এনে বিরোধের মধ্যে সংহতি খুঁজেছেন সন্ন্যাসী।

রবীন্দ্রনাথ বিবেকানন্দের এই সহিষ্ণুতাকে সবসময় সমর্থন করতে পারেন নি, মুক্তিসন্ধানী কবি সীমার মধ্যে বন্দী থাকতে পারেন নি। তাই মানবধর্মকে বিশ্বজনীন আসনে প্রতিষ্ঠা করছেন তিনি। যার সমর্থন মেলে ‘গোরা’ উপন্যাসে —

“আমি আজ ভারতবর্ষীয়। আমার মধ্যে হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান কোনো সমাজের কোনো বিরোধ নেই। আজ এই ভারতবর্ষের সকলের জাতই আমার জাত।... আপনি আমাকে আজ সেই দেবতার মন্ত্র দিন, যিনি হিন্দু-মুসলমান খৃষ্টান ব্রাহ্ম সকলেরই-যাঁর মন্দিরের দ্বার কোনো জাতির কাছে, কোনো ব্যক্তির কাছে, কোনদিন অবরুদ্ধ হয় না — যিনি কেবলই হিন্দু দেবতা নন, যিনি ভারতবর্ষের দেবতা।”^{২৪}

কবির এই ধর্মবোধ বিশেষ ধর্মের সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত হয়ে বিশ্ববোধের পথে হেঁটেছে। সেই পথে অসম্প্রদায়িক বাণী ঘোষিত। উপনিষদের বাণীতে আশ্রিত কবি তাই বললেন — “আমাদের উপনিষদের বাণীতে কোনো বিশেষ দেশকালের ছাপ নেই — তার মধ্যে এমন কিছুই নেই যাতে কোনো দেশের কোনো লোকের কোথাও বাধতে পারে। তাই সেই উপনিষদের প্রেরণায় আমাদের যা-কিছু কাব্য বা ধর্মচিন্তা হয়েছে সেগুলো পশ্চিমদেশের লোকের ভালো লাগবার প্রধান কারণই হচ্ছে, তার মধ্যে বিশেষ দেশের কোনো সংকীর্ণ বিশেষত্বের ছাপ নেই।”^{২৫} ব্রাহ্মধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়েও কবি সেখানকার সংকীর্ণতা মেনে নিতে পারেন নি। উপনিষদ্ ভাবনার উপর ভর করে গড, আল্লা, বিষ্ণু, শিব ইত্যাদি ঈশ্বরের সাম্প্রদায়িক নাম যে ভাবনায় পরিত্যক্ত। যে সাধনায় মন্দির, মসজিদ, গির্জার প্রয়োজন গৌণ। উপনিষদিক ধর্মের এই উদারতা ধর্মকে সকল দেশের সম্পদ করে রেখেছে। রবীন্দ্রনাথের সর্বজনীন ধর্মকে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে আচার্য প্রবোধ সেন মহাশয় তাঁর ‘রবীন্দ্রনাথের ধর্মচিন্তা’ প্রবন্ধে বলছেন — “ভারতবর্ষের ইতিহাসে বিভিন্ন ধর্মের বিরোধ নিরসনের ব্রত যাঁরা গ্রহণ করেছেন, তাঁদের মধ্যে অশোক, আকবর, রামানন্দ থেকে রামমোহন পর্যন্ত ধর্মসাধকগণ, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ ও মহাত্মা গান্ধীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।... এ পথের যাত্রীদের মধ্যে অগ্রণী হলেন অশোক। অতঃপর দীর্ঘ ব্যবধানের পর মধ্যযুগে কবীর, নানক, দাদু প্রমুখ এ পথে পদচারণা করেন। আধুনিক যুগের আরম্ভে রামমোহন এবং অন্তে রবীন্দ্রনাথ সর্বমানবকেই এ পথে আহ্বান জানান। এই পথের বৈশিষ্ট্য একদিকে বিশ্ববোধ এবং অপরদিকে চিরন্তনতাবোধ। যা কিছু খণ্ডকালীন এবং খণ্ডদেশিক তাকেই তাঁরা অগ্রাহ্য করেন।”^{২৬}

ত্যাগ, প্রেম, বৈরাগ্য মানবধর্মের অন্যতম ভিত্তি। আমরা যখন সমগ্র থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখি, তখন জীবন বিচিত্র সংঘাতকে আহ্বান জানায়। সেই আহ্বানে দুঃখ, দৈন্যতা অশান্তি, সাড়া দেয় জীবনের ইমারত নষ্ট করতে। আর জীবন যখন সমগ্রের সঙ্গে জড়িয়ে উপলব্ধি করে প্রকৃত শান্তি সুখ, তখনি অখণ্ডবোধে জীবন পরিপূর্ণ হয়। এই অখণ্ডতার মূল চাবিকাঠি ত্যাগ, ত্যাগই খণ্ডকে অখণ্ডে উত্তরণের পথ দেখায়। যেখানে আছে মোহ, আসক্তি যেখানে আছে অশান্তি, আর যেখানে জীবন ত্যাগের আনন্দে পূর্ণ, যেখানে জীবন নবরূপে সুখকে খুঁজে বেড়ায়। তাই ‘শিক্ষা’র ‘তপোবন’ প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন — “এই ত্যাগ নিজেকে রিক্ত করবার জন্যে নয়, নিজেকে পূর্ণ করবার জন্যেই। ত্যাগ মানে আংশিককে ত্যাগ সমগ্রের জন্য, ক্ষণিককে ত্যাগ নিত্যের জন্য, অহংকারকে ত্যাগ প্রেমের জন্য, সুখকে ত্যাগ আনন্দের জন্য।”

উপনিষদের “তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা” যেন সন্ন্যাসী জীবনদর্শনকেও আলোকিত করেছিল, তাই জীবনের স্বার্থ ত্যাগ করে বৃহত্তর স্বার্থের স্বপ্ন দেখছেন কবি, এবং অনাসক্ত হয়ে কর্ম করার আহ্বান জানিয়েছেন — “অনাথও হয়ে কর্ম করলেই কর্মের উপর আমার পূর্ণ অধিকার জন্মে — নইলে কর্মের সঙ্গে জড়ীভূত হয়ে আমরা কর্মের অঙ্গীভূত হয়ে পরি, আমরা কর্মী হই নে।”

৪) রবীন্দ্র-বিবেক ধর্মে মানুষ:

“আত্মা বা ইদমেক এবাথ্র আসীৎ। নান্যৎ কিঞ্চন মিষৎ। স ঈক্ষত লোকানু সৃজা ইতি”^{২৮}
অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্বে একমাত্র আত্মাই ছিলেন, অন্য কিছুই ছিল না, তিনি ইচ্ছা করলেন বিভিন্ন লোক সৃষ্টি করব। তাই নিজ আনন্দের জন্য তিনি জীব জগৎ সৃষ্টিতে মেতে উঠলেন। জীবের আনন্দের মধ্যেই নিজেই আনন্দ পেলেন, কারণ জীব তারই অংশ। উপনিষদে এইভাবে জীবের আনন্দেই ব্রহ্মের আনন্দ ঘোষিত। আর মোক্ষকামী জীবও চাই তাঁর আনন্দে বিলীন হতে। তাই মুক্তির জন্য সে যুগ-যুগান্তরের জন্ম-মৃত্যুর বেড়া অতিক্রম করে। অবশেষে জীব-ব্রহ্মের মিলনে জন্ম-মৃত্যুর অবসান ঘটে। সুতরাং জীব ব্রহ্মেরই অংশ। সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের চক্রে যে নিত্য আবর্তিত।

বেদান্তের আলোয় মুক্তিপিপাসু সন্ন্যাসীর কাছে মানুষই ঈশ্বর। জীবনের বুদ্ধ পথ অতিক্রম করে মানুষই পারে মুক্তি খুঁজতে। ‘দেবযান’র সিঁড়ি বেয়ে মানুষই পারে, পরম সত্যে উপনীত হতে। আন্তর উপাসনার মধ্য দিয়ে মানবসত্তা জাগ্রত হয়, সেখানে মানুষই ঈশ্বর হয়ে ওঠে —

“বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর?

জীবে প্রেম করে সেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।”^{২৯}

মানবধর্ম যেন জীবের প্রেমময়তার মধ্যেই নিহিত, তাই মানবপ্রেমের পথে ঘৃণা, বিদ্বেষ, হিংসা, হীনমন্যতা, অহংবোধ হলো প্রধান অন্তরায়, তাই মানুষকে ত্যাগ ও বৈরাগ্যের মস্ত্রে দীক্ষিত করে গেলেন সন্ন্যাসী।

আবার মানবতাবাদী দার্শনিক রবীন্দ্রনাথের কাছে মানুষ যেন নরদেবতা। মানুষ যেন কবির কাছে একান্ত আপন। সেই মানুষের সঙ্গে কর্মসূত্রে এক হওয়ার আহ্বান যেন কবির অনুভূতিতে স্পষ্ট, সবার নীচে সব হারাদের মাঝে নূতন প্রাণ খুঁজে পেয়েছেন কবি, তাই ‘মানুষের ধর্ম’ এর ভূমিকাতে কবির অনিভূতি —

“আমাদের অন্তরে এমন কে আছেন যিনি মানব অথচ যিনি ব্যক্তিগত মানবকে অতিক্রম করে ‘সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট’, তিনি সর্বজনীন সর্বকালীন মানব।... সেই মানুষের উপলব্ধিতেই মানুষ আপন জীবসীমা অতিক্রম করে মানব-সীমায় উত্তীর্ণ হয়।”^{৩০} এইভাবে মানবপ্রেমিক কবির কণ্ঠে বারংবার শোনা গেছে দরিদ্র নারায়ণের মুক্তির বার্তা।

রবীন্দ্রনাথ কোনো শাস্ত্রীয় ধর্মদর্শনে বিশ্বাস করতেন না, মানুষই তাঁর কাছে বড়ো। একদিকে তিনি যেমন কর্মী মানুষের জয়গান গেয়েছেন, তেমনি নিরক্ষর বাউল সাধকদের তত্ত্বকে সম্মান দিয়েছেন। নিরক্ষর বাউল সাধকদের কোনো শাস্ত্র নেই, অথচ তাঁদের ‘মনের মানুষ’ খোঁজার তত্ত্ব রবীন্দ্রমানসে ছাপ ফেলেছিল।

আবুল আহসান চৌধুরী ‘রবীন্দ্রনাথের বাউল’ প্রবন্ধে বলেছেন — “লালনের ‘খাঁচার ভিতর অচিন পাখি কেমনে আসে যায়’ রবীন্দ্রনাথের ভাবজগতের পরিচালিকাশক্তি হিসাবে — কাজ করেছে। এই গানটি তাঁর জীবনচেতনার প্রেরণা হিসাবে গৃহীত হয়েছে।”^{৩১}

উপনিষদ্ অনুসারে পুরুষই সর্বশ্রেষ্ঠ পুরুষই কথা, পুরুষই পরাগতি — “পুরুষান পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ”^{৩২} জীব, ব্রহ্ম পরম বন্ধু। ব্রহ্মের সঙ্গে মিলনের জন্যই জীবের ব্যাকুলতা। আর এই ব্যাকুলতাই বাউলকে সাধক করেছে। নিরঙ্কর বাউল সাধকেরা জানতেন না বেদান্তের শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন, কিন্তু অজান্তেই ব্রহ্মময় জগতের সবকিছুই তাঁদের কাছে অর্থহীন মনে হয়। দেহকেই তত্ত্ব-হিসাবে সাজিয়ে জীবনকে নিয়ে খেলা করেছেন তাঁরা। তাঁদের কাছে মানুষই ব্রহ্ম, মানুষই পরম পুরুষ আর তার মুক্তি হলো প্রেমের চিন্ময় প্রকাশ, তাই বাউলমতে প্রেমামৃত প্রার্থী দেবতাও পৃথিবীতে মানুষ হিসাবে জন্মাতে চান —

“প্রেম আমার পরশমণি তারে ছুঁইলে যে কাম হয় রে সেবা।

তাই গোলোক চায় যে ভুলোক হ’তে মানুষ হৈতে চায় যে দেবা।”^{৩৩}

সুতরাং প্রেমের মধ্য দিয়ে মানব দেহে দেবতার খোঁজ করেছে বাউল সাধকেরা, বাউলের প্রেম ভক্তি জ্ঞানের সাধনায় জীবন যখন পূর্ণ হয়ে ওঠে, ঋষিকবিও বাউলের উদারতায় মুক্ত হন — “আমার মুক্তি আলোয় আলোয় এই আকাশে।”^{৩৪} বাউলের এই মনের মানুষের মাঝে তাঁর জীবনদেবতাকে খুঁজে পেয়ে তিনি বললেন — “যে আপন দেবতাকে জানে আপনার মধ্যেই, তাকে বলে মনের মানুষ, মনের মানুষ মনের মাঝে করো অন্বেষণ।”^{৩৫} এদিকে স্বামীজি বেদান্তের দৃষ্টিতে মানবধর্মকে ব্যাখ্যা করলেও তাঁর নিজস্ব ভাবনায় সেই ধর্ম স্বতন্ত্রতার দাবী রাখে। পারমার্থিক দৃষ্টিতে জীব জগৎ অনিত্য হলেও ব্যবহারিক দৃষ্টিতে সবই সত্য। ব্যবহারিক জগতে যাবতীয় বস্তুর অখণ্ডবোধের মধ্য দিয়ে জীব-ব্রহ্মের ঐক্যানুভূতি জন্মায়। যাকে সন্ন্যাসী নির্বিকল্প সমাধি বলেছেন। সন্ন্যাসীর মতে মানবধর্মের মূল ভিত্তি শুধু মানবাত্মার একত্ব নয়, ব্যবহারিক দশায় জীবের বুদ্ধি, প্রাণ ও দেহের একত্ব, বুদ্ধি বা দেহের অহংকারে অন্যকে হয় মানবধর্মের অন্তরায়। তাই সকলের মধ্যে ঈশ্বর দর্শন করে সকলকে নিজের করে ভাববার কৌশল শিখিয়েছেন কবি-সন্ন্যাসী। তবে উপনিষদ্ বা বেদান্তের আলোয় জীবন আলোকিত হলেও রবীন্দ্রনাথ বিবেকানন্দের মানবধর্ম সব কিছুকে ছাপিয়ে এমন এক লোকের পথ দেখিয়েছে, যেখানে ত্যাগ, ভোগ, বৈরাগ্য, বিবেক, আত্মবোধ ও মৈত্রীর পথে মানুষই ঈশ্বর হয়ে উঠতে পারে।

সবশেষে বলা যায়, রবীন্দ্রনাথ বিবেকানন্দের এই সীমার মাঝে অসীমকে খুঁজে পাওয়ার কৌশল একই সরলরেখায় এসে দাঁড়িয়েছে। উভয়ের সাধনমার্গ আলাদা হলেও দুজনেই একই অদ্বৈত চৈতন্যে উত্তরণের কথা বলেছেন। কখনো দুইকে অবলম্বন করে একের সাধনা, কখনো বা এককে মধ্যমণি করে অসীমকে খোঁজা আবার কখনো ব্যক্তিগত জীবন সমস্যাকে অদ্বৈততত্ত্বে উত্তরণের পথ বলে মনে নেওয়া — এসবই নতুন দিকের উন্মোচন। নদী যেমন আঁকাবাঁকা পথে বয় গিয়ে সমুদ্রে মেশে, তেমনি বহু চড়াই-উতরাই এর মধ্য দিয়ে পরমাত্মায় বিলীন হয়। সেই সাধনা ব্যক্তিগত জীবন অনুভূতি দিয়ে আমাদের উপলব্ধি করিয়েছেন ঊনবিংশ শতাব্দীর এই দুই যুগনায়ক। জানি না বিবর্তনের পথে আর কোনো মহাপুরুষ জন্ম নেবেন কি না, বা বিবেক-রবির পুনর্জন্ম হবে কিনা, বা গঙ্গার একমুখো স্রোতকে সঙ্গে নিয়ে কেউ অদ্বৈত ব্যাখ্যা করবেন কিনা, তবে যতদিন বেদান্তের পাতায় অদ্বৈততত্ত্ব আলোচিত হবে, ততদিন বিবেক — রবির অদ্বৈতানুভূতি জায়গা নেবে দার্শনিকের সূক্ষ্ম মননশীলতায়।

তথ্যসূত্র:

১. স্বামী বিবেকানন্দ, ‘সখার প্রতি’, স্বামীজির বাণী ও রচনা (ষষ্ঠ খণ্ড), পৃ. ২১০

২. মনুসংহিতা, ২/১

৩. মুখ্য অনুশাসন, SELECT INSCRIPTIONS, VOL. 1, D.C. SIRCAR.ED.

CALCUTTA UNIVERSITY

৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মধুময় পৃথিবীর ধূলি, সঞ্চিতা, পৃ. ৮৩৩
৫. বৃঃ উঃ- ৪/৪/১৩
৬. শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ- ৪/১৭
৭. গীতাঞ্জলি -১১৯ সংখ্যক কবিতা
৮. ঈশোপনিষদ -২
৯. সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী
১০. স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা (প্রথম খণ্ড), পৃ. ৭৯
১১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ওরা কাজ করে, আরোগ্য, সঞ্চিতা, পৃ. ৮৩২
১২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দীক্ষা, সঞ্চিতা, পৃ. ৪৪১
১৩. কঃ উঃ- ১/২/১৮
১৪. বৃঃ উঃ -৩/৩/৬
১৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রাচীন ভারতে একঃ, ধর্ম, পৃ. ৫৪
১৬. গীতাঞ্জলি-৫ সংখ্যক কবিতা
১৭. ঈশোপনিষদ, মন্ত্র ৬
১৮. স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা (পঞ্চম খণ্ড), পৃ. ২৫৬
১৯. স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা (ষষ্ঠ খণ্ড), পৃ. ২১০
২০. স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা (তৃতীয় খণ্ড), পৃ. ১৮৩
২১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শান্তিনিকেতন, রবীন্দ্র রচনাবলী(সপ্তম খণ্ড), ৫৩৪
২২. বৃঃ উঃ- ৫/২/৩
২৩. স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা(তৃতীয় খণ্ড), পৃ. ৮২
২৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গোরা, অধ্যায় ৭৬
২৫. অগ্রসর হওয়ার আহ্বান, শান্তিনিকেতন (দ্বিতীয় খণ্ড) পৃ. ৪৯০
২৬. বিশ্বভারতী পত্রিকা(একাদশ খণ্ড), শ্রাবণ সংখ্যা ১৩৫৯, পৃ. ৩১।
২৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ত্যাগ, শান্তিনিকেতন, রবীন্দ্র রচনাবলী (সপ্তম খণ্ড), পৃ. ৫৩১
২৮. ওই উঃ -১/১
২৯. স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা (ষষ্ঠ খণ্ড) পৃ. ২১০
৩০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মানুষের ধর্ম, ভূমিকা অংশ
৩১. দৈনিক স্টেটম্যান (বিশেষ রবীন্দ্র সংখ্যা), ১৪১৮, পৃ. ৪০
৩২. কঃ উঃ -১/৩/১১
৩৩. ক্ষিতিমোহন সেন, বাংলার বাউল, পৃ. ৫৩
৩৪. গীতবিতান ১৯২৬ সংখ্যক সংগীত
৩৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মানুষের ধর্ম, পৃ. ৬৩

সহায়ক গ্রন্থ:

১. অনির্বাণ, উপনিষৎ প্রসঙ্গ (প্রথম খণ্ড), বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত, বর্ধমান, প্রথম প্রকাশ ১৩৭২, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৮৩, তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৯৬
২. ঘটক কল্যাণীশঙ্কর, রবীন্দ্রনাথ ও সংস্কৃত সাহিত্য, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ধমান প্রথম প্রকাশ, ১৯৮০, দ্বিতীয় প্রকাশ, ২০০০
৩. চট্টোপাধ্যায় পার্শ্বসারথি, রবীন্দ্র বিবেকানন্দ সম্পর্ক, নাথ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৪০২, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৯৬
৪. দাস করুণাসিন্ধু, রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যভাবনা প্রসঙ্গে, সারস্বত কুঞ্জ প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ, ১৪১৬
৫. নিয়োগী গৌতম, রবীন্দ্রনাথ ও মানুষের ধর্ম, অভিযান পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৪২০
৬. বন্দ্যোপাধ্যায় হিরণ্য, উপনিষদ ও রবীন্দ্রনাথ, নবপত্র প্রকাশন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৮০ চতুর্থ মুদ্রণ, ২০১২

৭. বসু নগেন্দ্রনাথ (সংকলক), বিশ্বকোষ (নবম ভাগ), বি আর পাবলিসিং কর্পোরেশন, দিল্লী, প্রথম প্রকাশ, ১৮৮৬-১৯১১, পুনর্মুদ্রণ, ১৯৮৮
৮. বসু যোগীরাজ, উপনিষদের ভাবাদর্শ ও সাধনা, বিশ্বভারতী, প্রকাশকাল, ১৯৭৫
৯. ভট্টাচার্য শাস্ত্রী, দীনেশচন্দ্র, বিবেকানন্দের বেদান্তচিন্তা, রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার, গোলপার্ক, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, ১৯৯০
১০. ভট্টাচার্য সুখময়, সংস্কৃতানুশীলনে রবীন্দ্রনাথ, অরুণা প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ, ১৯৮৪, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৯১
১১. মুখোপাধ্যায় প্রভাতকুমার, রবীন্দ্রবর্ষপঞ্জি, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৬২
১২. মুখোপাধ্যায় প্রভাতকুমার, রামমোহন ও তৎকালীন সমাজ ও সাহিত্য, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, প্রকাশকাল, ১৩৯৪, পুনর্মুদ্রণ, ১৩৯৪
১৩. রঞ্জনাতানন্দ, স্বামী-উপনিষদের শক্তি ও মনোহারিত্ব, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৮৬, তৃতীয় পুনর্মুদ্রণ, ২০০১
১৪. শঙ্কর, অচেনা অজানা বিবেকানন্দ, সাহিত্যম্, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ২০০৩, বিংশ সংস্করণ, ২০১১
১৫. সরকার দেবার্চনা, নিত্যকালের তুই পুরাতন, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্বে, কলকাতা, প্রথম প্রকাশকাল, ২০১৩
১৬. সেন ক্ষিতিমোহন, বাংলার বাউল, কলিকাতা, বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা, প্রকাশকাল, ১৯৯৩
১৭. ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ প্রণীত, আত্মপরিচয়, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৩৫০, পরবর্তী সংস্করণ, ১৪১৭
১৮. ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ প্রণীত, উপন্যাস সমগ্র, স্কুল লাইব্রেরী, কলকাতা, সর্বশেষ সংস্করণ
১৯. সেন অতুলচন্দ্র সম্পাদিত, উপনিষদ (অখণ্ড সংস্করণ), হরফ প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম খণ্ড, প্রকাশ, ১৯৭২, দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশ, ১৯৭৬, অখণ্ড সংস্করণ, ১৯৮০, পুনর্মুদ্রণ, ১৯৮০
২০. উপনিষদ (শঙ্করভগবৎকৃত ভাষ্যসমেতা), পণ্ডিত দুর্গাচরণ সাংখ্য, বেদান্ততীর্থ সম্পাদিত, দেব সাহিত্য কুটির প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, নবম সংস্করণ, ২০১০
২১. স্বামী জুষ্টানন্দ অনুদিত, কঠোপনিষদ (শঙ্করভগবৎকৃত ভাষ্যসমেতা), উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৭, পঞ্চম পুনর্মুদ্রণ, ২০১১
২৩. ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, গীতাঞ্জলি, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, প্রকাশকাল, ১৩১৭, পুনর্মুদ্রণ, ১৪১৯
২৪. ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, গীতবিতান (অখণ্ড সংস্করণ), বিশ্বভারতী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৩৩৮, পুনর্মুদ্রণ, ১৪২১
২৫. বেদান্তদর্শনম্, স্বামী চিদ্ধ্যনানন্দ পুরী ও শ্রী আনন্দ বা ন্যায়াচার্য সম্পাদিত, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, পঞ্চম পুনর্মুদ্রণ, ২০০৬
২৬. বেদান্তদর্শনম্, কালিবার বেদান্তবাগীশ সম্পাদিত, দেবসাহিত্য কুটির প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রকাশ, ২০১০
২৭. বেদান্ত মুক্তির বাণী, স্বামী চৈতন্যনন্দ সংকলিত, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, ১৯৮৭-৮৮, ১৩তম পুনর্মুদ্রণ, ২০১২
২৮. বেদান্তসারঃ, কালিবার বেদান্তবাগীশ সম্পাদিত, সেন্ট্রাল বুক পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রকাশ, ১৪০২ বঙ্গাব্দ বৃহদারণ্যকোপনিষদ (সমগ্র খণ্ড), পণ্ডিত ৮দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ সম্পাদিত, দেব সাহিত্য কুটির প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, পঞ্চম সংস্করণ, ২০০১
২৯. মনুসংহিতা (কুল্লুকভট্টটীকা সহিত), মানবেন্দ্র বন্দোপাধ্যায় সম্পাদিত, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, ১৪১০, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৪১৬
৩০. ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, মানুষের ধর্ম, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৩৩, পুনর্মুদ্রণ, ১৪১৮

৩১. ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র রচনাবলী, (প্রথম খণ্ড), বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, প্রকাশকাল, ১৩৯৩ বঙ্গাব্দ, পুনর্মুদ্রণ, ১৪০৯
৩২. ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র রচনাবলী (দ্বিতীয় খণ্ড), বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, প্রকাশকাল, ১৩৪৬ বঙ্গাব্দ, পুনর্মুদ্রণ, ১৩৬৩
৩৩. ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র রচনাবলী (অষ্টম খণ্ড), বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, প্রকাশকাল, ১৩৪৮ বঙ্গাব্দ, পুনর্মুদ্রণ, ১৩৬০ বঙ্গাব্দ, পুনর্মুদ্রণ, ১৩৫৯
৩৪. ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র রচনাবলী, (চতুর্দশ খণ্ড), বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, প্রকাশকাল, ১৩৫৪
৩৫. শ্রীমদ্ভগবদগীতা (মধুসূদন সরস্বতী টীকা সহিত), শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ব্রহ্ম সম্পাদিত, নবভারত পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, ১৩৯৩, পুনর্মুদ্রণ, ২০০৬
৩৬. স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা (প্রথম খণ্ড), উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, ১৯৬৪, ৩তম পুনর্মুদ্রণ, ২০১৫
৩৭. স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, (দ্বিতীয় খণ্ড), উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, ১৯৬৪, ২৯তম পুনর্মুদ্রণ, ২০১৩
৩৮. স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, (পঞ্চম খণ্ড), উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, ১৯৬৪, ২৬তম পুনর্মুদ্রণ, ২০১৩

পত্র-পত্রিকা:

১. উদ্বোধন, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ১১৬ তম সংখ্যা, ১৪২০ বঙ্গাব্দ
২. দৈনিক স্টেটম্যান, (বিশেষ রবীন্দ্র সংখ্যা) কলকাতা, ১৪১৮ বঙ্গাব্দ
৩. সংস্কৃত বিভাগীয়া গবেষণা পত্রিকা, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ধমান, ২০১০

Original Text (English Ed.):

1. ISOPANISAD, Sitanath Goswami, Sanskrit Pustak Bhandar, Kolkata, 3rd ed. 2005, Rpt. 2010
2. Swami Vivekananda and His Work, Swami Abhedananda (Ed.), 3rd Edn, Ramkrishna Vedanta math, calcutta, 1950

Reference Book (English Ed.):

1. Borchert, Donald, (Ed.), ENCYCLOPEDIA OF PHILOSOPHY (VOL.9), THOMSON GALE, 2nd Edition, 1934
2. Butcher, S.H, Aristotle's theory of Poetry and Fine Art, Dver Publication, I.N.C, 4th Edition.
3. Lokeswarananda, swami, Aspects of Vedanta, Ramkrishna Mission Institute of Culture, Kolkata, 1st ed.1995, 1st Rpt.2009

লেখক পরিচিতি: কৃষ্ণ ধীবর, সহকারী অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ, রামপুরহাট কলেজ, বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ।